ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 54- 64
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.179

শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোর অন্তর্বর্তী সমাজচেতনা

রাহুল দে, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 02.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstarct

Criminal tendencies among individuals are not uncommon, they are identified as 'criminals' by breaking the fence of well-established principles, rules, reforms or state-specific laws. The police system and intelligence forces have been developed to suppress the crimes that are constantly committed in society. And when a detective proves the crime based on his keen intelligence, logic or assumption and identifies the criminal, then that layered flow of events arouses curiosity with the drama of suddenness. Readers or listeners who are thirsty for stories become interested in listening to such stories. A new genre of social stories is created---detective stories. Social truth is revealed there in a different way. Sharadindu Banerjee was familiar with detective stories from home and abroad. It cannot be said that he did not imitate, there was no assimilation; however, Sharadindu Byomkesh Bakshi is a Bengali character who is deeply involved in Bengali life and culture. His keen observational skills have revealed the mystery of the murder and the psychology of many characters and the contemporary social background. Not only are the characters he creates truth-seekers, but Sharadindu himself seems to have fulfilled the social responsibility of truth-seeking here, in a sense he is also a 'truth-seeker'. In the discussed article, we will shed light on how Sharadindu's detective stories reveal the socio-economic-political history of the then Bengali society. Among his various literary works, he has completely relied on detective stories to portray the social character of the then post-independence and pre-independence period.

Keywords: Society, political and moral situation, decline of morality, degradation of social values, social status of the criminal

১৯৩০-এর কাছাকাছি। গত শতকের শেষ থেকে বাঙালি জাগরণের যে ঢেউ উঠেছিল, তার রেশ সমানে চলছে। পাঁচকড়ি বাবুর দেবেন্দ্রবিজয় বসু সাহেবী প্যান্টালুনের বিকল্প মালকোঁচা-মারা ধুতি পরে আসরে নেমে পড়েছিল। পাঁচকড়ি দের উদ্দেশ্য সাধু ছিল। কিন্তু বিদেশি গোয়েন্দা-কাহিনি যে তিনি অনুকরণ করতেন এবং তা একটুও চাপা থাকত না। তবুও একথা বলা যায়, বাঙালি গোয়েন্দার খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছিল-প্রিয়নাথ দারোগার দপ্তরে বা শৌখিন বুদ্ধিজীবীর অ্যাডভেঞ্চারে, এই ভাব-যেখান থেকে হোক বাঙালির নিজস্ব খাঁটি , যদিও বাংলার মিল্টন, বাংলার স্কট, বাংলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এই নিয়ে উত্তেজনা তখন স্তিমিত, সাহিত্যে নোবেল করতলে, তবুও বাঙালির সামনে অনর্জিত অজস্র রাজ্য। বাঙালি তখন একটি শার্লক হোমস প্রয়োজন অনুভব করল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটু আগে বা সমকালে অন্যেরাও এই জরুরি সন্ধানে লেগে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কথা প্রথমেই মনে পড়বে। তিনি বলে কয়ে বিমল কুমার জয়ন্তদের বাঙালির গৌরব বলে চালাতে চেয়েছিলেন। তবে একে বিলিতি

ক্রাইম স্টোরি থেকে ধার করা গল্প তাতে সযত্নে নেহাৎ কিশোর-পাঠ্যের সীমায় তাদের আটকে রাখার চেষ্টা; তাই বেশি এগোতে পারলেন না। আর নীহার গুপ্তের কিরীটি রায়ের কথা যত কম বলা যায় ভাল। বিলিতি গল্পের নকলনবিশী, দাঁতে পাইপ চিবিয়ে গোয়েন্দাপ্রবরের সাহেবিয়ানা, সস্তা মোটা জাতের বহিরঙ্গ কাজ-কারবার সাহিত্য-বোদ্ধা রহস্য-রসিক পাঠকের কাছে এই গোয়েন্দাকে প্রিয় করে তুলতে পারেনি। এমন সময় শরদিন্দু বাবুর ব্যোমকেশের আবির্ভাব। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ৫ বছরে ১০টি গল্প ছাপা হল। তার মধ্যে 'সীমন্ত হীরা', 'মাকড়সার রস', 'চোরাবালি', 'রক্তমুখী নীলা' একেবারে পয়লা সারির লেখা। আর এই ১০ টি গল্পের মধ্যে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালি পাঠকের দীর্ঘকালের স্বপ্ন সার্থক করল। শুধু পুরোদস্তুর বাঙালি বলেই নয়, শার্লক হোমস প্রেরণার উৎসে এবং ফাদার ব্রাউন পাশে থাকলেও, গল্পগুলির মৌলিকতার জন্য, এমন কি অপরাধীর মন এবং পাপের বৈশিষ্ট্যে দেশকালের বাস্তবতা এমন মুদ্রিত যে এদের চেনাজানা লোক বলেই মনে হয়। বাঙালি এতকালে, একটা নিজস্ব অপরাধের জগত, এক দল খাঁটি বাঙালি অপরাধী, তথা এক বাঙালি গোয়েন্দা পেয়ে যেন বর্তে গেল। না, গোয়েন্দা নয়, শব্দটা শুনলেই কেমন পুলিশ স্পাই মনে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের দেশে শব্দটা ঘৃণার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই একটি সম্মানজনক নূতন নামকরণও হল 'সত্যান্বেষী'।

গবেষণাপদ্ধতি:

গবেষণাপত্রটি তৈরি করতে গিয়ে আমরা মূলত বিশ্লেষণাত্মক গবেষণাপদ্ধাতি ও বর্ণনামূলক গবেষণাপদ্ধতির ব্যবহার করেছি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে মূলত আকর গ্রন্থদুটির অর্থাৎ শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ (১৪২১) এবং শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ (১৪১৯) (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা) এই দুটি উপর নির্ভর করে আমাদের আলোচনাটি প্রস্তুত করেছি।

বিশ্লেষণ:

শরদিন্দু তাঁর রহস্য-কাহিনিগুলিকে এতটা গুরুত্ব দিতেন যে তাঁর সব শ্রেণির সৃষ্টির মধ্য থেকে এদেরই বেছে নিলেন যুগটিকে প্রকাশ করার জন্য। ৩৭-৩৮ বছর ধরে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের যে অগ্রগতি, তার যে জটিল ক্রমবিকাশ, সে কথা বলার দায়িত্ব দিলেন কতগুলি গোয়েন্দা গল্পকে। তিনি তো ইতিহাসাশ্রয়ী অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন, শিল্পগুণে সেগুলিও কিছু কম নয়। অর্থাৎ ঐ সব কাহিনি লিখতে গিয়েও তাঁর শিল্পীমন পুরোই জেগেছে। তাতে নানাভাবে সমকাল প্রতিফলিত। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস যেভাবে স্তরে স্তরে উন্মোচিত হল ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, তা মুদ্রিত হয়ে আছে রহস্য গল্পগুলিতে। সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার প্রত্যক্ষ বাহন হয়ে রইল তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি। এই ব্যাপারটি না করলে রহস্য-কাহিনি হিসেবে ওদের উপভোগে যে হানি হত তা মনে হয় না। কিন্তু ঐ জিনিসটি থাকার ফলে গোয়েন্দা গল্পে এসেছে বাস্তবতার ভিত্তি, ঘটেছে দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। গল্পগুলি অনেক বেশি বাঙালি হয়ে উঠেছে। শুধুই স্থান-কালের চিহ্নহীন কাল্পনিক তথা অলীক গল্পোসল্পের মজা পেতে কিন্তু গল্পগুলি জাতীয় ইতিবৃত্তের অঙ্গ হয়ে পড়ায় সে মজা বেড়েই শুধু গেল না, জীবনের-সমাজের গাঢ়তার রঙে স্বাদ হয়ে উঠল বর্ণাঢ্য।

শরদিন্দুর গোয়েন্দা গল্পের ভূগোলটাও কৌতূহলোদ্দীপক। বেশির ভাগ গল্প কলকাতার। তবে বাইরেরও বেশ কয়েকটি আছে। (১) চোরাবালি-উত্তরবঙ্গের এক জমিদারি। (২) ব্যোমকেশ ও বরদা-মুঙ্গের। (৩) চিত্রচোর-গিরিডি। নাম না করলেও অভ্রখনির কথা আছে। গিরিডি-মধুপুর রেল লাইনটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। (৪) দুর্গরহস্য-গিরিডি থেকে অল্প দূরে পাহাড় ও বন ঘেরা স্থান। মনে হয় পরেশনাথ পাহাড় দেখে কল্পিত। (৫) চিড়িয়াখানা-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম, কলকাতা থেকে ঘন্টাখানেক রেলের পথ। (৬) বহ্নিপতঙ্গ-পাটনা। (৭) অমৃতের মৃত্যু-ধান-প্রধান গঞ্জ ও কাছের গ্রাম। বর্ধমান, হুগলীর কোনও রেলস্টেশন হতে পারে। (৮) শেলরহস্য-পুনার কাছে মহাবলেশ্বরে, কিছুটা কলকাতায়। (৯) অচিন পাখি-পুরনো মফঃস্বল শহর, কলকাতা থেকে তিন ঘন্টার পথ। (১০) কহেন কবি কালিদাস-রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল, কয়লা খনি ও সন্নিহিত শহর। (১১) অদৃশ্য ত্রিকোণ-মফঃস্বলের এক বড় শহর।

অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ গল্প কলকাতার বাইরে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কলকাতায়। কলকাতার গল্পের মধ্যে সীমন্ত হীরা, আদিম রিপু একটুখানি বাইরে গেছে। প্রথমটিতে একবার উত্তরবঙ্গে এক জমিদারবাড়িতে, দ্বিতীয়টিতে ব্যোমকেশের শালার বাড়ি পাটনায় কয়েকদিনের জন্য। মোটামুটি কলকাতার বাইরের বাংলার প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানে

গল্পের যাতায়াত আছে। জায়গা বাছাই করার কোন চেষ্টা নেই। সত্যজিৎ ফেলুদা-কাহিনিতে বাঙালির পর্যটনকে রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত করে একটা বিশেষ স্বাদ এনেছেন, নানা মামুলি স্থানে ঘটনা ঘটিয়েছেন যেমন, তেমনি বাঙালির প্রিয় ভ্রমণ-কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। পুরী, দার্জিলিং, বারানসী, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই, চেন্নাই, কৈলাস, হাজারিবাগ, কাশ্মীর, কেদার, এক আধবার লন্ডন, হংকংও ঘুরে আসা হয়েছে। এরকম কিছু ছিল না শরদিন্দুর মনে। তিনি ভ্রমণের, বিশেষ করে শারদ পর্যটন-রসের জন্য বাড়তি কিছু করেননি। চোরাবালিতে ছিল উত্তর-পূর্ব বঙ্গের আরণ্য প্রকৃতির পটভূমি। সেটা অখণ্ড বাংলার কথা। পরে দেশভাগের পরে লেখক পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় বন্ধ হয়ে গেছেন। আর সন্নিহিত বিহারে-গিরিডি -মুঙ্গের-পাটনায়। গিরিডিতে ব্যোমকেশ গিয়েছিল স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য, মুঙ্গেরে অবকাশ-যাপনের জন্য, আর পাটনায় শ্বশুর বাড়িতে অর্থাৎ শালার বাড়িতে বেড়াতে। ব্যোমকেশ রহস্য-ভেদের কাজে গেছে পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে আমন্ত্রিত হয়ে। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে গল্প শুনতে শুনতে রহস্যভেদ করেছে। ব্যোমকেশ স্বাধীন সরকারের গোপন কাজে দেশের নানা স্থানে গিয়েছে-তার খবর আছে, তবে একটি ছাড়া সে সব রহস্য-ভেদ কাহিনি-আকারে পরিবেশিত নয়। এইরূপ এক কাজে মহারাষ্ট্রে যায় ব্যোমকেশ এবং মহাবালেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে একটা রহস্য সমাধান করে-শৈলরহস্য। উত্তর বঙ্গে চোরাবালিতে বেড়াতে গিয়ে আর একবার পর্যটন-মিশ্র রহস্য গল্প জমিয়ে তোলা হয়েছে। শরদিন্দু এই সব গল্পে-কলকাতার বাইরের আঞ্চলিকতাকে মাঝেমধ্যে চমৎকার উপভোগ্য করে তুলেছেন, কখনও আবার স্থানিকতাকে রহস্য-নির্মাণে ও ভেদে, রহস্যরস ঘন করে তোলার কাজে তাৎপর্য দিয়েছেন। 'চোরাবালি', 'দুর্গরহস্য' 'শৈলরহস্য' এদিক থেকে সেরা। গল্পগুলোর রহস্য-রস সম্ভোগ করার সময়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কোন আকর্ষণী প্রকৃতি-রূপ না থাকলেও মামুলি মফঃস্বল টাউন বা কয়লা-শহর চলচ্চিত্রের মত জলজ্যান্ত হয়ে গল্পের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে 'কহেন কবি কালিদাস'-এ।

কলকাতায় যত কাণ্ড ঘটেছে তার বেশির ভাগের কেন্দ্রে ব্যোমকেশের হ্যারিসন রোডের মেস, তার বিয়ের পরে যা হয়ে দাঁড়ায় ওদের ফ্লাট। কলকাতার ১৭টা অপরাধের ব্যোমকেশ সমাধান করেছে এখান থেকে। দুটি গল্পে অপরাধী আড্ডা গেড়েছে ব্যোমকেশের মেসে (উপসংহার, ছলনার ছন্দ), একটিতে অপরাধীর মনের আব্রু খোলা হয়েছে ব্যোমকেশের ঘরে (রক্তমুখী নীলা)। শেষ ৫টাতে (অসম্পূর্ণ বিশুপাল বধ ধরে) গোয়েন্দাগিরি হয়েছে ব্যোমকেশের নিজের দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলা রোডের বাড়ি থেকে।

কলকাতার ২২টি কাহিনিতে বাঙালির প্রিয় মহানগরীকে কাল-প্রবাহের চলচ্চিত্রে ধরে রেখেছেন শরদিন্দু। খুব বেশি করে আছে হ্যারিসন রোডকে কেন্দ্র করে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার অনেকখানি। মাকড়সার রস, অর্থমনর্থম, অগ্নিবাণ, রক্তমুখী নীলা, আদিম রিপু, রক্তের দাগ, মণিমণ্ডন, অদ্বিতীয়, দুষ্টচক্র, হেঁয়ালির ছন্দ, খুঁজি খুঁজি নারি-- এদের কাণ্ডকারখানা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে প্রায় হাঁটা পথের মধ্যে ঘটেছে। উপসংহারের অনেকখানিও। গল্প চৌরঙ্গী পর্যন্ত গিয়েছে মগ্নমৈনাকে, পথের কাঁটায়। সত্যান্বেষী এবং উপসংহারের উপসংহার মধ্য কলকাতার মিশ্র এলাকায়। কলকাতা ধরা আছে তার সর্ববিধ বৈচিত্র্যে। তাঁর আঁকা উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার মানচিত্র সমকালের পাঠকদের কাছে ছিল একান্ত পরিচিত, বাস্তব-ফলে সমকালে ঐ সব গল্প পড়তে পড়তে একেবারে ঘরের কাছে জানাশোনার মধ্যে ক্রাইমগুলি ঘটছে বলে বাস্তবতার আর একটা মাত্রা পাওয়া যেত। আর উত্তরকালের পাঠকদের কাছে তাঁর গল্প হল অতীত কলকাতাকে-ইতিহাসের কলকাতাকে জীবন্ত করে ফিরিয়ে আনা। বাঙালির কাছে ভিড়ের চৌরঙ্গী, গভীর রাতের রেডরোড (পথের কাঁটা), থিয়েটার, (বিশুপাল বধ), আধুনিক কায়দার বড় হোটেল (রুম নং ২), ছোট হোটেল (আদিম রিপু), বিখ্যাত গ্রান্ড হোটেল (সীমন্ত হীরা) আত্মীয়ের মত। ছোট কিন্তু বর্ধিষ্ণু কারখানা এবং তার মালিকের বাগান ও লনওয়ালা বসত বাটি (শজারুর কাঁটা), ধনী অবসরপ্রাপ্তের বহুতল প্রাসাদ (বেণীসংহার, অর্থমনর্থম) , ব্যবসায়ীর (রক্তের দাগ), ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদের সুরম্য ভবন (মগ্নমৈনাক)। নানা ধরনের ভাড়া বাড়ি, নির্মীয়মান বাড়ি। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স (রক্তের দাগ), ব্যায়াম সমিতির কুস্তির আখড়া (রক্তের দাগ)। সিনেমায় রাতের শো (অর্থমনর্থম, আদিম রিপু)। অনেক গল্পে গৃহবন্দী ব্যাধি-পঙ্গু বা জরাগ্রস্তের আশ্রয়-স্বরূপ একটিমাত্র কামরা (মাকড়সার রস, খুঁজি খুঁজি নারি, দুষ্টচক্র, অদ্বিতীয়), বনেদী পুরনো হতশ্রী আবাস (দুষ্টচক্র, আদিম রিপু), ভাড়াবাড়ির রহস্য (অদ্বিতীয়), মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের রান্নাঘর (অগ্নিবাণ), যানবাহন হিসেবে, ট্রাম, টানা রিকস, ট্যাক্সির ব্যবহার, প্রাইভেট গাড়ি তো আছেই। আছে রবীন্দ্র-সরোবর আর কলেজ স্কোয়ারকে ক্রাইমের স্থানরূপে কাজে লাগানো, কলেজ

স্ট্রিট পাড়ার বইয়ের দোকানও আছে। সব মিলে কলকাতা কলকাতাই। এর সঙ্গে ক্রাইমকে এমন মিলিয়েছেন যে গোয়েন্দাগিরি এবং ক্রাইম বস্তুটা একেবারে দেশি, প্রায়ই হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে কলকাত্তাই।

লেখক ব্যোমকেশ কাহিনি গুলিতে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সারা দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক ক্রমবিকাশের পটভূমিটি জীবন্ত করে রেখেছেন। শুধু কালানুক্রমিক বিবরণ নয়, লেখকের মনোভাব গল্পগুলির মধ্যে ভাষ্যের মত জড়িয়ে সংশ্লিষ্ট পাপ এবং প্রায়শ্চিত্তকে জাতীয় চরিত্র দিয়েছে। লেখকের মুম্বাই যাবার আগেকার গল্পকটিতে তিনের দশকের প্রথম দিকের মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘটনাবিরল জীবনের ঢিমেতাল। রাজনৈতিক কলকোলাহল তখন জাতিকে উদবেজিত করেনি এমন নয়, কিন্তু শরদিন্দু গল্পের ঘোরে সেদিকে ফিরে তাকাননি। কিন্তু ১৯৫০-এর পরে তাঁর গল্পে দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, দেশভাগের যন্ত্রণা, তারপর ক্রমিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ধরা পড়েছে। তাছাড়া ক্রাইমের স্বভাব কখনো কখনো খুব বেশি করে সময়কে বিদ্ধ করেছে। সেটাও খুব তাৎপর্যবহ। (কারণ গোয়েন্দা কাহিনিকে এতখানি জীবনের সঙ্গে মেশানো বিশ্বের রহস্য গল্পের ইতিহাসেও দুর্লভ।)

'চিড়িয়াখানা' (জুলাই ১৯৫৩) উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। কাহিনি প্রারম্ভেই কাল-পটভূমির উল্লেখ করে বলা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এক গ্রীষ্মকালের ঘটনা। ব্যোমকেশ বক্সীর কাছে উপস্থিত নিশানাথ সেন, একসময়ে বোম্বাই-এর বিচারবিভাগে সেশন জজ, 'শারীরিক' কারণে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বর্তমানে কলকাতার অদূরে ২৪ পরগণার মোহনপুরে তৈরি করেছেন 'গোলাপ কলোনী' বলেছেন- 'গোলাপ কলোনী আমার ফুলের বাগান। আমি ফুলের ব্যবসা করি। শাক সবজিও আছে, ডেয়ারি ফার্মও আছে।' অর্থাৎ প্রাক্তন জজ নিশানাথ সেন এখন ফুল-সবজির ব্যবসাদার। শুধু তাই নয়, গোলাপ কলোনীতে যারা তাঁর অধীনে কাজ করে মালীদের বাদ দিলে তারা সকলেই ভদ্র শ্রেণির, 'কিন্তু সকলেই বিচিত্র ধরনের লোক।' এদের মধ্যে একদল আছে যারা কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না, আরেক দলের অতীত জীবনে 'দাগ' আছে। প্রথম দলে যদি পড়ে পানুগোপাল, তাহলে দ্বিতীয় দলে রয়েছে ভুজঙ্গধরবাবু-

> "ডাক্তার ছিলেন, সার্জারিতে অসাধারণ হাত ছিল... কিন্তু তিনি এমন একটি দুর্নৈতিক কাজ করেছিলেন যে তাঁর ডাক্তারির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন কলোনীর ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার...।"[১]

নিশানাথ সেনের 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ আবিষ্কার করেন কলোনীর বাসিন্দাদের বিচিত্র সব জীবনবৃত্তান্ত। দময়ন্তী নিশানাথবাবুর স্ত্রী নন, সহবাসিনী; অধুনা বৈষ্ণব ব্রজদাস চুরির অপরাধে জেল-খাটা আসামী, একদা রসায়নের অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত কটুভাষী কুটিল ও দাম্ভিক, তার পরীক্ষার ফল এখন বিপরীত হয়। আঙুল-কাটা রসিক আগে কারখানায় কাজ করত, এখন কলোনীর হিসাব দেখে। ভুজঙ্গধরের স্ত্রী নৃত্যকালী ওরফে সুনয়না ওরফে বনলক্ষ্মী একদা অভিনেত্রী ছিল, প্রণয়াসক্ত ধনী ব্যবসায়ীকে খুন করে উধাও হয় ইত্যাদি। এ কি শুধু গোয়েন্দা কাহিনি? একে সামাজিক উপন্যাস বলতে বাধা কোথায়? প্রেম-পরিণয়-অবৈধ সম্পর্ক-ব্ল্যাকমেল-ঈর্ষা-লোভ-হত্যা এসবই তো জীবনযাপনের অঙ্গ। আর এই বিচিত্র জীবনই উপন্যাসের আলম্বন। 'চিড়িয়াখানা'-এই সামাজিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাই তার গোয়েন্দা চরিত্রের কার্যকলাপে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর 'মগজাস্ত্রে'র বিবিধ কলাকৌশল এর অন্যতম আকর্ষণ। এইজন্যই 'চিড়িয়াখানা'র অন্য একটি শ্রেণীগত পরিচয় গোয়েন্দা কাহিনি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক উপন্যাস লেখেননি এমন নয়, 'বিষের ধোঁয়া', 'ছায়াপথিক' কিংবা 'রিমঝিম' এর উদাহরণ। ব্যক্তিহৃদয়ের টানাপোড়েন এবং সিনেমা-জগতের পরিবেশ এইসব উপন্যাসে যতটা প্রাধান্য লাভ করেছে, সামাজিক সমস্যাজনিত সংকট ততটা গভীরতর হয়ে ওঠেনি। তুলনায় সমসময়ের দর্পণ হিসেবে, সমাজবাস্তবতার অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যোমকেশের কাহিনি সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। স্মর্তব্য, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল এইরকম-

> "... গোয়েন্দা কাহিনিকে আমি ইনটেলেকচ্যুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়। প্রতিটি কাহিনিকে আপনি শুধু সামাজিক উপন্যাস হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনি মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়- ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনও কখনও সামাজিক সমস্যাও

> এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে আছে বিষবার পদস্খলন।... জীবনকে এড়িয়ে কোনদিন গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করিনি।"[২]

সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে ব্যোমকেশ দেখেছে বেশিরভাগ মানুষ অর্থ কিংবা কাম, ক্রোধ কিংবা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে অপরাধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা চালিত হয় প্রথম ও তৃতীয় রিপুর দ্বারা। বিপত্নীকের নৈশাভিসার, অসুখী দাম্পত্য, অবৈধ প্রণয় কিংবা প্রচণ্ড অর্থলোভক্রমশ এদের স্বাভাবিক জীবনসীমার বাইরে এনে ফেলে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করে। অনুকূল ডাক্তারের মতো অর্থপিশাচ কিংবা অনাদি হালদারের মতো আদিম রিপুতাড়িত চরিত্র মানবজীবনের নৈতিক শৃঙ্খলার অবক্ষয়ের বৈনাশিক দিকটিকেই তুলে ধরেছে ব্যোমকেশের কাহিনিতে। অনাদি হালদারের মতো 'অসভ্য বজ্জাত ছোটলোক'কে খুন করার জন্য প্রভাতকে ক্ষমাই করেছে ব্যোমকেশ। 'হেঁয়ালির ছন্দ' গল্পে যে ভূপেশবাবু পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল নটবর নস্করকে খুন করে, ব্যোমকেশ তাকেও ক্ষমা করেছিল, বলেছিল, দাঁড়কাক মারলে যদি ফাঁসি না হয় তবে 'শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। অপরাধী যুগলের মৃত্যু আত্মহত্যা কিংবা পলায়ন (যেমন, বহ্নিপতঙ্গ, চিড়িয়াখানা, কহেন কবি কালিদাস ইত্যাদি) কখনো তাকে স্বস্তিই দিয়েছে, 'চোরাবালি'র জমিদারকে দিয়েই দেওয়ান কালীগতির মৃত্যুদণ্ড বিধান করেছেন ব্যোমকেশ। অপরাধীকে ধরার জন্য ব্যোমকেশ 'মগজাস্ত্র'ই ব্যবহার করেছে, অন্য কোনো মারণাস্ত্র নয়। কালো টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে, চোরাই অস্ত্র উদ্ধার করেছে, দেশের প্রতিরক্ষা তহবিলে একলক্ষ টাকা আদায় করে নিয়েছে, গোপন চিঠি হাতবদলের জন্য লক্ষাধিক টাকার উৎকোচ নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে। সব মিলিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশের ব্যক্তিত্বে এমন একটা মহত্ত্ব তথা সামাজিক মধ্যে ২২টি গল্পেরই পটভূমি শহর কলকাতা এবং দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে বেশ কিছু গল্পের সময়কাল ১৯৫৩-১৯৭০।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শহর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সমকালীন নানারকম অস্থিরতা, সামাজিক নানা সমস্যা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে গভীরভাবে আহত করেছিল। সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গরল সঞ্চিত হয়েছিল, তার উৎসের সত্যসন্ধানে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ এই সমাজদৃষ্টির জন্যই দেখা যায় 'রাষ্ট্রবিপ্লব' শব্দটা ব্যোমকেশের গল্পে একাধিকবার এসেছে। রাষ্ট্রবিপ্লব অর্থে শুধু প্রাণনাশী দাঙ্গাই নয়, এর অনুষঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে সামাজিক দুর্নীতি ও নৈরাজ্য। কখনও এমন মনে হয়েছে-

> "স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাঁচে, কাঁকর ও তেতুঁল বিচির গুঁড়া খাইয়া কতদিন বাঁচিব?"[৩]

(আদিম রিপু) চারপাশে যখন 'প্রকাশ্য হত্যার পাইকারি কারবার', সেই প্রেক্ষাপটেই এই কাহিনি সূত্রপাত-

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলাদেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যু দেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সেকেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমানকাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?"[৪]

জাতির এই অবস্থার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরদিন্দু সমকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন-

> "কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিশ আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।"[৫]

এই উদাসীন শহরের পটেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দেখে নিতে চেয়েছিলেন ক্রমশ ভেঙে-পড়া সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে। বিশৃঙ্খল এই পরিবেশেই তো পুত্রের পছন্দের পাত্রীকে বিবাহ কিংবা নগদ অর্থে কিনে নিতে চায়

অনাদি হালদার, পালক পিতাকে এজন্য হত্যা করে প্রভাত। আর সেই মেয়েটি, শিউলি, সিনেমার দালাল গদানন্দ তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং বিয়ে করে, এই নিয়ে তৃতীয়বার। গদানন্দর আগের দুই বউ-এর মৃত্যু রহস্যজনক। এই বিপর্যস্ত সময়েই কেষ্ট দাস অনাদি হালদারকে ব্ল্যাকমেল করে, ন্যাপা বিকল্প চাবি তৈরি করে সিন্দুক খোলে। এমনকি তৎকালীন মুসলিম লিগ সরকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ থানার জমাদারের মন্তব্য। অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর ন্যাপা থানায় খবর দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলেছিল-

> "থানায় কেউ ছিল না। একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে-যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কীসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাও গে।"[৬]

অনিশ্চিত বিপর্যস্ত এই সময়ের ভার তখন তুলে নেয় বাঁটুল, এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্বঘোষিত পরিত্রাতা-গুণ্ডার সর্দার।

> "বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে, পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার অজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে। সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাঁটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।"[৭]

বাঁটুল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে জলের দরে কেনা আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষকে বিক্রি করত। বোঝা যায়, দাঙ্গার সেইসব ভয়ানক দিনে অনেকেই নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখত। এই বাঁটুল চরিত্ররা কিন্তু লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নয়, সেই সময়ের গর্ভেই এই ধরনের গুণ্ডার জন্ম এবং ভদ্রলোকেরাও যে তাদের খাতির করত, অন্তত প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করত না তার প্রমাণ ব্যোমকেশের বাড়িতে বাঁটুলের যাতায়াত এবং অস্ত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব। স্বাভাবিক অবস্থায় বাঁটুলরা অবাঞ্ছিত, তাদের কার্যকলাপ অনৈতিক এবং শাস্তিযোগ্য; কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে জাতির সংকটকালে তারাই যে 'প্রয়োজনীয়' হয়ে ওঠে, সেই সত্যকে শরদিন্দু অস্বীকার করেননি এবং এই বিরোধাভাস সমাজের সর্বস্তরেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে ব্যোমকেশের যোগাযোগ যেমন 'আদিম রিপু' গল্পের স্থানিক চেহারাটাকে জাতীয় স্তরে বিস্তৃত করেছে, তেমনই চোরাকারবারে অর্জিত প্রায় লাখ দু'য়েক টাকা পুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতার প্রভাতে মহত্ত্বের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বস্তুত, 'আদিম রিপু'র দেশকালপট শরদিন্দুর সমাজবাস্তবতাবোধের গভীরতাকে সম্যক ধারণ করে আছে। এমনকি রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রেললাইনের দু'ধারে বেড়ে ওঠা ঘাস কিছু জমা নিয়ে ও গোয়ালাদের সেই ঘাস বিক্রয় করে বিকাশ যে কিছু উপার্জন করছে, এই ছোট খবরটিও তিনি দিতে ভোলেননি।

'সত্যান্বেষী' গল্প লেখা হয়েছে মাঘ ১৩৩৯-এ। সেইসময়কার কলকাতা শহর ও কোকেন-কেন্দ্রিক ব্যবসা ও অপরাধের উল্লেখ আছে এই গল্পে। আছে কলকাতার এক বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক খুঁটিনাটি-

> "... এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার একদিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্যদিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ।"[৮]

দিনের বেলায় শান্ত কর্মব্যস্ত নিরীহ এই অঞ্চলটির চেহারা রাতের দিকে পাল্টে যায়। নিস্তব্ধ প্রায় জনহীন এই পাড়াটাকে তখন অনেকে এড়িয়ে যাওয়ার বা দ্রুত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

> "পুলিশের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে, সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। একদল চতুর অপরাধী পুলিশের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্তভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"[৯]

অবশেষে এই রহস্যের সমাধান করে 'সত্যান্বেষী' ব্যোমকেশ বক্সী। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ছদ্মবেশে কোকেনের কারবারী অনুকূলবাবুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। স্বার্থরক্ষার্থে মানুষের নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা ঐ ভাটিয়া আর অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময়েই পথের কাঁটা সরাবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, দেখা যায় কন্টকবিদ্ধ হয়ে যারা মারা গেলেন তারা প্রায় সকলেই প্রৌঢ়, অপুত্রক

এবং অর্থবান।বোঝা যায়, সম্পত্তি হস্তগত করার লক্ষ্যেই পথের কাঁটা দূর করতে চেয়েছেন কেউ কেউ এবং সেইসূত্রেই পথের কাঁটা দূরীকরণের অভিপ্রায়ে আরও কেউ সামিল হয়েছে। মানুষের আত্যন্তিক লোভের এ-এক উদাহরণ। যুদ্ধের পর অস্ত্রের চোরাকারবার প্রায় দেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং স্বভাবতই সমাজজীবনের পক্ষে তা অনুকূল ছিল না। 'রক্তের দাগ' (আষাঢ় ১৩৬৩) কিংবা 'অমৃতের মৃত্যু' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬) গল্পে শরদিন্দু এই বিষয়টির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'রক্তের দাগ' গল্পে নন্দ জানিয়েছে 'যুদ্ধের পর অনেক চোরাই পিস্তল কিনতে পাওয়া যেত' এবং মল্লবীর ভূতেশ্বরের কাছে একটা লোক চোরাই পিস্তল বিক্রি করতে এসেছিল। অমৃতের মৃত্যুর কারণ সে এইরকম এক অস্ত্রব্যবসায়ীকে দেখে ফেলেছিল। সান্তালগোলার কাছাকাছি বাঘমারি গ্রামে ছিল বিশ্বনাথ দাসের চোরাই অস্ত্রের ভান্ডার। এ কাহিনিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে-

> "গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংসুক নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি-নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্দ্যস্ত করিয়া তুলিল।"[১০]

এই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালোবাজারীদের চিহ্নিত করে এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিল ব্যোমকেশ।

চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল মারাত্মক প্রাণঘাতী কয়েকটি বিষের ব্যবহার। 'বহ্নিপতঙ্গ' (১৯৫৬) কাহিনি শুরুতেই রয়েছে পারিপার্শ্বিক অবক্ষয় ও ক্রমবিনষ্টির ছবি-'মহাযুদ্ধের চিতা নিভিলেও আকাশ বাতাস চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, তদুপরি স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা।' বস্তুত, দেশের স্বাধীনতালাভের উল্লাসের গভীরে যে কতবড় ক্ষত ছিল, শরদিন্দুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা' ধরা পড়েছিল। পুলিশ অফিসার পুরন্দর পাণ্ডে সেই সামাজিক দুষ্টক্ষতেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন-

> "এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে ঠগ-জোচ্চোর-খুনী-বদমায়েসের সংখ্যা বেড়ে গেছে, ...বিদেশী সিপাহীরা এসে নানারকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে। কতরকম নেশার জিনিস, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।"[১১]

এমনই একটা সাংঘাতিক মারণ-বিষ 'কিউরারি' রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আরও একটি সত্যের প্রকাশ ঘটে এই বিশৃঙ্খল নীতিবর্জিত পরিবেশে কেননা-

> "যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে। তখন বিবেক বুদ্ধির মুখোশ পড়ে খসে, কাঁচা-খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুনকো আমাদের সভ্যতা।"[১২]

কিন্তু ব্যোমকেশের কাছে আরও ভয়ানক মনে হয়েছে সেইসব মুখ, যারা বাইরে শান্তশিষ্ট নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ণ নখদন্ত বিশিষ্ট।

'বহ্নিপতঙ্গ' উপন্যাসেও দীপনারায়ণ সিং-শকুন্তলার কাহিনিকে কেন্দ্র করে বিহারের উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত সমাজের যে ছবি আছে, আপাত-ভদ্রতার আড়ালে তার নীচতা ও বিকৃতি লেখক যেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এলিট সমাজকে সন্তুষ্ট রেখে নিজের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাওয়া দীপনারায়ণ, প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন জগন্নাথ ডাক্তার, দেওয়ান গঙ্গাধর বংশী কিংবা লম্পট মিথ্যাবাদী নর্মদাশঙ্করের মতো চরিত্রের মধ্যে দিয়ে 'বহ্নিপতঙ্গ'—এ ফুটে উঠেছে সামাজিক অনৈতিক পরিবেশ। শকুন্তলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা, কিন্তু সে-ও বিবাহিত জীবনের শর্তকে লঙ্ঘন করেছে। বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গোপন অভিসারে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী শকুন্তলাকে পাবার লোভে দীপনারায়ণকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশীদার। অর্থাৎ রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা যে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কও বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, সত্যান্বেষীর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সেই প্রচ্ছন্ন সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন শরদিন্দু, ব্যোমকেশ-পাঠককে টেনে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন এই সমাজ-দর্পণের সামনে-গল্পের সত্য থেকে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সমাজের সত্যে।

মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, শরদিন্দুর এই গোয়েন্দা কাহিনিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের একটা অনুপুঙ্খ ও বিশ্বস্ত চিত্র আছে এবং তার ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু কম নয়। এইসূত্রেই

ব্যোমকেশের গল্পে একান্নবর্তী পরিবার, প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে সংঘাত ও সৌহার্দ্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে। সপুত্রক ব্যোমকেশ-সত্যবতী ও লেখক অজিতের পারিবারিক জীবনের মধুর ছবিটিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পাশাপাশি শহরের অভিজাত ও অনভিজাত পরিবারের অন্দরমহলের গল্পে বিচিত্র জীবন-প্রবাহের কৌতূহলকর নানা দিক ধরা পড়েছে। যেমন, অর্থমনর্থম্ (১৩৪০) গল্প। অর্থবান করালীবাবু অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের যে ছবি ব্যোমকেশের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তা এইরকম করালীবাবুর পোষ্য পাঁচজন-তিন ভাগ্নে এবং শ্যালিকার দুই ছেলে-মেয়ে। তিন ভাগ্নের মধ্যে মতিলাল এবং মাখনলাল দুজনেরই বাড়ির 'বাইরে' যাবার নেশা আছে, ফণিভূষণ বিকলাঙ্গ, শ্যালিকা-পুত্র সুকুমার ডাক্তারি পড়ে, সত্যবতী তার বোন। করালীবাবু প্রায় নিয়মিত উইল বদল করতেন এবং সেটা তার মেজাজের ওপর নির্ভর করত কখন কাকে সম্পত্তি দেবেন কিংবা বঞ্চিত করবেন। করালীবাবুর মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার ব্যোমকেশের কাজ, তা আলোচনার পরিসরও বর্তমান প্রবন্ধ নয়; কিন্তু এটা স্পষ্ট যে এই কাহিনিতে বাড়ির আশ্রিতদের যে ছবি ধরা পড়েছে তা খুব সন্তোষজনক নয়। কিংবা ধরা যাক্ 'মগ্নমৈনাক' (১৯৬৩) গল্পটি। সন্তোষ সমাদ্দার খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ধনী ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু চরিত্রবান ছিলেন না। কার্তন-গায়িকা সুকুমারীর সঙ্গে গোপন ডেরায় সপ্তাহান্তিক দিনগুলি কাটাতেন। আর দেশভাগের সময়ে ঢাকায় মীনা নাম্নী এক সুন্দরী গুপ্তচরের সঙ্গে তার প্রণয় ছিল, ফলে রাজনৈতিক দৌলোতে নিযুক্ত সন্তোষ সমাদ্দার মোহমত্ত ভাবে দেশের গোপন তথ্য তাকে শুধু মৌখিকভাবে নয়, চিঠিতে লিখেও পাচার করতেন। ব্যোমকেশ বলছে-

> "অবস্থাটা ভেবে দেখ, রাজনৈতিক কূটযুদ্ধ চলছে, ওদের গুপ্ত অভিপ্রায় আমরা কিছুতে আমি জানি না, ওরা আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায় সমস্ত জানে।ফল অনিবার্য।
>
> স্নতশবাবুর তখন এমন মহোমত্ত অবস্থা জে,তিনি মীনাকে কেবল মৌখিক গুপ্তকথা জানিয়ে নিরস্ত হননি, যখন কলকাতায় থাকতেন তখন চিঠি লিখে তাকে গুপ্ত সংবাদ জানাতেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী আমি জানি না,সম্ভত অন্য কোন দেশনেতার প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা।কিন্তু তিনি জেনেশুনে মীনাকে খবর পাঠাতেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।... তিনি জানতেন মীনা বিপঞ্জ দলের গুপ্তচর।"[১৩]

মীনার কন্যা হেনা এই চিঠিগুলি নিয়ে সন্তোষবাবুকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে এবং পরে সন্তোষ সমাদ্দার ছাদ থেকে ঠেলে হেনাকে হত্যা করে। সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি পর্যন্ত তার স্বামীকে বিশ্বাস করত না, বাইরের লোকের কাছেও স্বামীর চরিত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্রেও যে কত নীতিহীনতা লুকিয়ে থাকতে পারে, এই গল্পে তার দৃষ্টান্ত আছে। শরদিন্দু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেশের দুর্গতির কারণ চিহ্নিত করেছেন 'দেশদ্রোহী' দেশপ্রেমিকের মুখোশ খুলে দিয়ে। হেনাকে নিয়ে উদয়চাঁদ-যুগলচাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য, চামেলিদেবীর বিরূপতা, চিংড়ির ঈর্ষা নেংটির কৌতূহল-সব মিলিয়ে একটা পারিবারিক ছবি আছে। 'অগ্নিবাণ' (বৈশাখ ১৩৪২) গল্পে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-র কাছ থেকে অব্যাহতি পেতে বিষ-বারুদে দেশলাই তৈরি করেছিলেন বৈজ্ঞানিক দেবকুমারবাবু, কিন্তু অসাবধানে দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যু হয়েছে তার প্রথম পক্ষের মেয়ে রেখা ও ছেলে হাবুলের। দ্বিতীয় স্ত্রী-র মৃত্যুর পর জীবনবীমার টাকা দিয়ে দেবকুমারবাবু নিজের ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবার নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। 'মণিমণ্ডন' (মাঘ ১৩৬৫) ও কহেন কবি কালিদাস' (বৈশাখ ১৩৬৮) গল্পে ধনবান ব্যবসায়ী পিতার সঙ্গে পুত্র-পুত্রবধূর সম্পর্ক মধুর। তবে শেষোক্ত গল্পে ধনী-পুত্রের অসৎ সংসর্গে পড়ে জুয়া খেলার কথা আছে।

পারিবারিক জীবনচিত্র পরিস্ফুটনের প্রসঙ্গে কখনও কখনও উচ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিংবা নারীর শিক্ষার মতো বিষয়। 'রক্তের দাগ' গল্পে উচ্ছৃঙ্খল যুবক সত্যকামের বে-হিসেবি দিনযাপনের কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যোমকেশ পৌঁছে গেছে তার জন্মপরিচয়গত রহস্যে। জানা গেছে সত্যকাম উষাপতিবাবুর সন্তান নয়। সুচিত্রা এম্পোরিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা রমাকান্ত চৌধুরীর গর্ভবতী কন্যা সুচিত্রার সঙ্গে দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্ট অনাথ দরিদ্র যুবক উষাপতির বিয়ে দিয়েছেন এবং ক্রমে তাকে দোকানের আট-আনা অংশীদার করেছেন। রমাকান্ত চৌধুরীর বক্তব্য ছিল এইরকম-

> "সুচিত্রা ছেলেমানুষ, মা-মরা মেয়ে; তার ওপর আজকাল দেশে যে হাওয়া বইতে শুরু করেছে তাতে মেয়েদের সামলে রাখাই দায়। সুচিত্রা খুবই ভাল মেয়ে, কেবল বর্তমান আবহাওয়ার দোষে

> একটু ভুল করে ফেলেছে। আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যাপার হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়, কিন্তু বাইরের লোক কি জানতে পারে?"[১৪]

রাজকন্যা দাগী হলেও অর্ধেক রাজত্বের প্রলোভনে শেষপর্যন্ত ঊষাপতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যকামের বেপরোয়া জীবনযাপনকে মানতে পারেনি। স্ত্রী-র কানীন পুত্রকে শেষপর্যন্ত খুন করেছিল উষাপতি। ব্যোমকেশও সময়কে সাক্ষী রেখে বলেছিল-

> "প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঁধন ভাঙার একটা ঢেউ এসেছিল, উচ্চবিত্ত সমাজের অবাধ মেলা-মেশা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুচিত্রা আলোর নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে একটু বেশি মাতামাতি করেছিলেন।... কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তাঁর হুঁশ হল।"[১৫]

সত্যকাম লম্পট বটে, কিন্তু 'মেয়েরাও নেহাত নির্দোষ নয়'- এই সত্যটি ব্যোমকেশ উচ্চারণ করেছিল। 'বহ্নিপতঙ্গ'-এ শকুন্তলার স্বাধীন-বিহারের কথাটি আগেই বলা হয়েছে। 'অগ্নিবাণী'-তে রুদ্র ডাক্তারের ছেলে নন্তুর সঙ্গে রেখার প্রণয় এবং পণ বিষয়ে পারিবারিক মনোমালিন্য, 'খুঁজি খুঁজি নারি'-তে রামেশ্বরবাবুর মেয়ে নলিনীর স্বেচ্ছাবিবাহ ও পারিবারিক অসন্তোষ এবং 'শজারুর কাঁটা' (মার্চ ১৯৬৭)-তেও অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। দীপা মেয়ে-স্কুল থেকে 'সীনিয়র কেম্ব্রিজ' পাশ করেছিল, একেবারে পর্দানশীন নয় তবে 'বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে'-এমনই বাড়ির সিদ্ধান্ত। দীপার মন কিন্তু বিদ্রোহে ভরা।

> "তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলাদেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতা নেই।"[১৬]

এ গল্প যখন লেখা হচ্ছে তখন স্বাধীনতার পর দুটি দশক পেরিয়ে গেছে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করছে। সে সময়েও কলকাতা শহরের কিছু রক্ষণশীল বনেদি পরিবারে মেয়েদের অবস্থান কিরকম ছিল, এ গল্পের পরিসরে তা ধরা পড়েছে। এহেন দীপা যখন ভিন্ন জাতের এক যুবকের প্রেমে পড়ে এবং তাকে বিবাহ করতে চেয়ে পিতামহের অনুমতি চায় তখন তিনি চিৎকার করে ওঠেন-

> "এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে। তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?"[১৭]

দীপা বাড়ি থেকে পালাতে গিয়েও পারেনি, নজরবন্দী হয়ে থেকেছে, তারপর অভিভাবকদের মনোনীত পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর প্রতি কীভাবে তার প্রাথমিক বিরাগ পরে প্রবল অনুরাগে পরিণত হল তা' এই আলোচনার অভিমুখ নয়। কিন্তু নানাবিধ অনুশাসনের মধ্যে থেকেও মেয়েরা যে সেদিন নিজেদের অনুভবকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, সেটাই বড়ো কথা। 'চিত্রচোর' গল্পে দেখি বিধবা রজনী আর ডাক্তার ঘটক বিবাহে সম্মত হয়েছে, কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় তা গোপন রাখাই শ্রেয় মনে করেছে। 'চোরাবালি' গল্পে জমিদার-গৃহে আশ্রিতা বিধবা রাধা মৃত সন্তান প্রসব করে বিতাড়িত হয়েছে, জমিদার হিমাংশুবাবু তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছে। শুধু নারীর অসহায়তা নয়, কখনও যে তারা কী ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, লেখক তার ইঙ্গিত দিতেও ভোলেননি। 'অদ্বিতীয়' (ফাল্গুন ১৩৬৮) গল্পটির সূচনায় এমনই এক সময়ের পটভূমি-

> "কিছুকাল হইতে কলিকাতা শহরে এক নূতন উৎপাতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে... কখনও একটি, কখনও বা একাধিক ভদ্রশ্রেণির যুবতী তাক্ বুঝিয়া দুপুরবেলা বাহির হয়। পুরুষেরা তখন কাজে গিয়াছে, বাড়িতে মেয়েরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিতেছে।এই সময় যুবতীরা গিয়া দরজায় টোকা মারে... গৃহিণী ভাবেন ফেরিওয়ালী, তিনি দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি যুবতীরা ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, ছুরি বা পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।"[১৮]

জেনানা ফাটকের এক বন্দিনী জেলখানার গার্ডকে খুন করে নিরুদ্দিষ্ট, স্বামী-স্ত্রী মিলে ধনবান ব্যবসায়ীকে খুন করে ফেরার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বিরল নয়। এমনকি বর্ষীয়সী ডাক্তার শোভনা রায় সুকান্ত সোমকে ছুরিকাঘাতে খুন করে তার মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে (রুম নম্বর দুই, জুলাই ১৯৬৪)। অর্থাৎ সমাজে মেয়ে-অপরাধীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না-এমন একটা আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ব্যোমকেশের কাহিনিগুলির মনোযোগী পাঠে রাষ্ট্রের পুলিশি-ব্যবস্থার একটা ছবিও ফুটে ওঠে। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর তথা ডিটেক্টিভ তথা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সঙ্গে প্রায় সব গল্পেই স্থানীয় থানা, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন-অধস্তন কর্মচারী কখনও বা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনা ঘটেছে। আর এইসূত্রেই উন্মোচিত হয়েছে পুলিশি ব্যবস্থার বেশ কিছু দৈন্য। - 'অচিন পাখি' এবং 'অদৃশ্য ত্রিকোণ' গল্পে মূল অপরাধী হচ্ছে স্থানীয় থানার দারোগা। 'বহ্নিপতঙ্গ' উপন্যাসে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী স্বয়ং দীপনারায়ণ হত্যার সঙ্গে জড়িত, শেষে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিণতি। 'চিত্রচোর' গল্পে পাণ্ডেজী স্বয়ং বলেছেন-

> "পুলিশের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিশ তো আছেই। তাছাড়া পুলিশের পেটে কথা থাকে না।"[১৯]

বলাবাহুল্য, পুলিশিব্যবস্থার এই দুষ্ট ক্ষতটিকে যথার্থ চিহ্নিত করার মতো সাহস সেদিন লেখকের ছিল।

উপসংহার:

এইভাবে দেখা যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশকাহিনিগুলি সমকালের সমাজ-ইতিহাসের এক বিশ্বস্ত চিত্র হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বলা যায় তাঁর খ্যাতির সিংহভাগ জুড়ে আছে ঝিন্দের বন্দী, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুঙ্গ ভদ্রার তীরে-র মতো ঐতিহাসিক রোমান্স। এই রোমান্সের টানেই তাঁর গল্পে এসেছে রহস্য-রোমাঞ্চের আবহ। 'ডিটেকটিভ গল্প' শীর্ষক রচনাটিতে শরদিন্দু একবার বলেছিলেন-

> "দুয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়? একটা অতীতের romance, অন্যটা বর্তমানের romance.... ডিটেকটিভ গল্প যদি অপাংক্তেয় হয় তবে historical romance-ও অপাংক্তেয়..."[২০]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনাপ্রবণ মন ঐতিহাসিক এবং গোয়েন্দা-এই দুই ধরনের কাহিনি মধ্যেই রোমান্সের সন্ধানে তৃপ্তি পেয়েছিল। রোমান্স রচনাই যেমন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, তেমনই সাহিত্য রচনাকালে ঐতিহাসিকের বাস্তবতাবোধ কাম্য মনে করেছিলেন। অধ্যাপক অলোক রায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন- "কেমন করে রোমান্টিক কল্পনার সঙ্গে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে মেলানো সম্ভব তারই নিদর্শন শরদিন্দু-সাহিত্য"। (অলোক রায়, 'সত্যান্বেষী শরদিন্দু', ছোটোগল্পে স্বদেশ স্বজন, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০) কালসচেতন এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই শরদিন্দুর গোয়েন্দা কাহিনি কেবলমাত্র হত্যা এবং হত্যাকারীর খুঁটিনাটি বর্ণনা নয়। বরং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে চরিত্র নির্বাচন করে দেশকালের বাস্তব পটভূমিতে তাদের স্থাপন করে পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহে তাদের যুক্ত করে গোয়েন্দা গল্পকেও একটা সামাজিক অবয়ব, সামাজিক তাৎপর্য দেবার চেষ্টা করেছেন শরদিন্দু। সমকালের নানা ভাঙন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্যথিত চিত্তে, দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রতি তাঁর অন্তরে একটা আলাদা জায়গা ছিল। সমাজের দুষ্টচক্রের কার্যকলাপ তাঁকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত করেছিল। শাসনের দণ্ড তাঁর হাতে ছিল না, কিন্তু অভিভাবকোচিত একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলি তুলে ধরে মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকটি দেখিয়ে দিয়ে তাকে আলোকিত করায় প্রয়াস তিনি আন্তরিকভাবেই করেছিলেন।অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যাপারে ব্যোমকেশের মনোভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও সহৃদয়তা এখানে পাঠক স্মরণ করতে পারেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনও বলেছিলেন-

> "ব্যোমকেশের গল্পে যদি সাহিত্যরস না থাকিয়া শুধু thrill ও সস্তা sensation থাকে তবে সাহিত্য বিচারকগণ তাহাকে দ্বীপান্তরিত করুন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি তাহা থাকে তবে শুধু ডিটেকটিভ বলিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার কাহারো নাই।"[২১]

এবং অন্যত্র বলেছিলেন-

> "আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বধর্ম। কাউকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই, গল্প লেখার ব্যাপদেশে Socialism, Marxism প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করাও আমার কাজ নয়। আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি।"[২২]

শরদিন্দুর 'বাস্তবের romance'-এর এই-ই বৈশিষ্ট্য যে তা' জীবন-বিবিক্ত নয়, বরং প্রাত্যহিকতায় প্রাণবান, দেশকাল সম্পৃক্ত। ব্যোমকেশ তাঁর intellect ও intuition দিয়ে সমাজের সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, ব্যোমকেশ ও তাঁর স্রষ্টা তাই দুজনেই 'সত্যান্বেষী'।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪২১, পৃ. ৩৭০।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪১৯, পৃ. ৬৪৭।

৩. তদেব, পৃ. ১২।

৪. তদেব, পৃ. ১৭।

৫. তদেব, পৃ. ১৭।

৬. তদেব, পৃ. ৩৬।

৭. তদেব, পৃ. ১৮।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রয়োত্রিংশ মুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪২১, পৃ. ২০৮।

৯. তদেব, পৃ. ১৫।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস ২য় খণ্ড ব্যোমকেশ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৪১৯ , পৃ. ২০৮।

১১. তদেব, পৃ. ১০৩।

১২. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৩. তদেব, পৃ. ৪১৬।

১৪. তদেব, পৃ. ১৮৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১৮৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৪৯২।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৯৩।

১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৪।

১৯. তদেব, পৃ. ২৬৫।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু। শরদিন্দু অমনিবাস দ্বাদশ খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ত্রিংশমুদ্রণ অগ্রহায়ন, ১৩৯৯ , পৃ. ২১৬।

২১. তদেব, পৃ. ২১৬।

২২. তদেব, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫।